বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ২৯ বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৮

জাতীয় আয়ে নারীর অবদান : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

হোমায়রা আহ্‌মেদ*

১। ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, যদিও কয়েক বছর আগেও পুরুষের সংখ্যা ছিল নারীর অধিক। গত কয়েক বছরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবায় নারীর প্রবেশ বৃদ্ধি পাওয়ায় নারী শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার বেশ হ্রাস পেয়েছে। যার ফলে আজ বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা (Life Expectancy) যেমন প্রায় সমান সমান হয়ে গেছে তেমনি মোট জনসংখ্যায়ও তাদের ভাগ সমান সমান হয়ে গেছে। দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল এ দেশের সমাজ প্রাচ্যের অন্যান্য অনেক দেশের মতোই পুরুষতান্ত্রিক, যার আওতায় পরে এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীর অবদানের সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। অর্থনীতির মূল খাতে বাংলাদেশের নারীর অংশগ্রহণ আশির দশকের শেষভাগে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে বহুগুণে বৃদ্ধি পেলেও নারী সর্বদাই এ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে এসেছে। তৈরি পোশাক খাত ছাড়াও অন্যান্য খাতে নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপক এবং তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি তাদের সনাতনী কর্মক্ষেত্র কৃষিতেও তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য হতে দেখা যায়, গত ১০ বছরে কৃষি ক্ষেত্রে পুরুষের অংশগ্রহণের হার যেখানে হ্রাস পেয়েছে সেখানে নারীর অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে লক্ষণীয়ভাবে। তবুও পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়, সেগুলো জাতীয় আয়ে নারীর অবদান অতি নগণ্য। এর মূল কারণ হিসেবে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়, সেগুলো হলো:

ক. উৎপাদনশীল পরিমণ্ডলের সিংহভাগ ক্ষেত্রে নারীকে অনুৎপাদনশীল ও কেবল ভোগকারী হিসেবে চিহ্নিত করা।

খ. উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে যেমন, কৃষি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে যথাযথভাবে জাতীয় পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত না করা

গ. নারীর গৃহস্থালির কাজ (Household Work) অর্থনৈতিক কাজ (Economic Work or Market Labour) হিসেবে গণ্য না হওয়া।

ঘ. কর্মক্ষেত্রে এবং গৃহস্থালির কাজে নারীর সমন্বিত অংশগ্রহণকে একটি পরিমাপযোগ্য একক মানদণ্ডে এনে তুলনামূলক পরিসংখ্যান পদ্ধতির অভাব (সুলতানা ১৪০৮ এবং আহ্‌মেদ ২০০৭)।

---

* লেখক বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (বিআইডিএস) গবেষণা সহযোগী (রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট) হিসেবে কর্মরত। বর্তমান প্রবন্ধটির রচনার জন্য লেখক বিআইডিএস-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. ঋতা আফসারের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। একই প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. আনোয়ারা বেগম, ড. প্রতিমা পাল মজুমদার এবং ড. নাজনীন আহমেদ বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে সাহায্য করেছেন। গবেষণা কর্মকর্তা পূরবী মজুমদার, শায়লা পারভীন, ইফরাত আরা আরজু, খোরশেদ আলম এবং মুদ্রাক্ষরিক আমেনা খাতুনের সহায়তা অনস্বীকার্য। তবে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রুটির দায়িত্ব লেখকের।

গৃহকর্ম (Home-making) বা গৃহস্থালির কাজকে (Household Work)[১] অর্থনৈতিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান এবং পরিসংখ্যানভুক্ত করার সর্বজনস্বীকৃত (Unanimous) কোনো পদ্ধতি এখনও প্রচলিত নয়। আর তার ফলে দেশের ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়স্ক কর্মক্ষম নারী জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশকে 'গৃহবধূ' (Housewife) আখ্যায়িত করে রাষ্ট্রের মোট শ্রমশক্তির বাইরে রাখা হয়। জাতিসংঘ ১৯৫০ সালে যখন প্রথম System of National Income Accounting (SNA) পদ্ধতি প্রকাশ করে তখন তাতে যে সমস্ড় পণ্য এবং সেবা পারিবারিক ভোগের জন্য উৎপাদিত হয়, এবং যা বাজারজাত করা হয় না সেগুলোকে জিডিপি'র বাইরে রাখা হয়। ১৯৯৩ সালে SNA কিছুটা সংশোধন করে তাতে পারিবারিক ভোগের জন্য উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাকে অর্থনৈতিক কর্মকা" বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বর্তমানে ৮২টি দেশে গৃহস্থালি কাজে ব্যয়িত সময়ের জরিপ পরিচালনা করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে এ ব্যাপারে এখনও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। আমাদের অর্থনীতিবিদদের মতে ঘরের ভেতর এবং বাইরে নারীর কাজগুলোর অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করলে জিডিপি'তে নারীর অবদান দ্বিগুণ হবে (হামীদ ১৯৮৯)।

১.১। উদ্দেশ্য ও তথ্য উৎস

উপরোক্ত হিসাবগুলোতে নারীর ঘরে বাইরের সব মজুরিহীন কাজের হিসাব গ্রহণ করা হয়নি। তাছাড়া নারী যখন গৃহের বাইরে উপার্জনকারী ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে তখন তার উপযুক্ততা থাকা সত্ত্বেও তাকে যে নিয়োজন করা হয় নগণ্য পরিমাণ উৎপাদনশীল কাজে, এই তথ্যটিও উঠে আসেনি। এই তথ্যটি অতি জর"রি। কেননা, নগণ্য পরিমাণ উৎপাদনশীল কাজগুলো অনেক ক্ষেত্রেই পরিসংখ্যানে কম প্রাধান্য পায়। তাছাড়া নারীর উৎপাদনশীলতার পূর্ণ প্রতিফলন হয় না পরিসংখ্যানে। একজন কর্মজীবী নারী অনেক ক্ষেত্রে গৃহিণী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব এড়াতে পারেন না বলে গৃহ হতে দূরবর্তী এলাকায় কাজ করতে সীমাবদ্ধতা অনুভব করেন। অথচ দূরবর্তী এলাকার কাজগুলো সাধারণত উচ্চ উৎপাদনশীল হয়। একই কারণে একজন কর্মজীবী গৃহিণী যখন অন্য জেলায় যেতে হবে বলে তার চাকুরিতে পদোন্নতি গ্রহণ করেন না তখনও তিনি তার উৎপাদনশীলতা হারান এবং জাতীয় আয়ে উচ্চ হারে অবদান রাখতে ব্যর্থ হন। উপরন্তু একজন কর্মজীবী নারীর গৃহিণী হিসেবে তাঁর অবদানকে তুলনা করা হয় পূর্ণকালীন গৃহবধূদের (Full Time Home-maker) সঙ্গে যাঁরা গৃহস্থালি কাজে সময় ও মনোযোগ বেশি দিতে পারেন বলে ধারণা করা হয়, তিনি গৃহে বেশি উৎপাদনশীল (more productive)। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে ঘরের বাইরে চাকুরির ফলে একজন চাকুরীজীবী নারীর সময়ের গুণগতমান একজন অচাকুরিজীবী নারীর চাইতে বেশি। যার ফলে গৃহের কাজে কম সময় ব্যয় করেও তিনি অচাকুরিজীবি নারীর মতো উৎপাদনশীল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি উৎপাদনশীল (Paul-Majumder 1986)।

জাতীয় আয়ে নারীর অবদান নির্ণয়ের জন্য পূর্বে যে সমীক্ষাগুলো সম্পন্ন করা হয়েছিল তাতে এই সত্যগুলোও বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়নি। তাছাড়া আরও যে সত্যটি বিচেনায় গ্রহণ করা হয়নি তা হলো, নারীর উপার্জনের প্রান্ড়িক উপযোগিতা (Marginal Utility) কম বলে ধরে নেওয়ার বিষয়টি। বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় পুর"ষকেই গৃহের কর্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় বলে তাকেই পরিবারের ভরণপোষণকারী মেনে নেওয়া হয় এবং তার উপার্জনই পরিসংখ্যানে প্রাধান্য পায়। আরও একটি যে

[১] গৃহকর্ম (Home making) এবং গৃহস্থালীর কাজ (Household work) কে এ প্রবন্ধে একই অর্থে (Interchangeably) ব্যবহার করা হয়েছে।

সত্য পূর্বের গবেষণাগুলোতে গুর"ত্ব পায়নি তা হলো, কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্য। কর্মক্ষেত্রের লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে নারীর সঠিক উৎপাদনশীলতা এবং অবদান জাতীয় আয়ে প্রতিফলিত হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধে এইসব সত্যগুলো বিবেচনায় গ্রহণ করে জাতীয় আয়ে নারীর অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি পরিবারে ও সমাজে নারীর অবদানের আর্থিক মূল্য (Monetary Value) নির্ণয়ের একটি প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের কিছু তথ্য প্রাবন্ধিক কর্তৃক দৈব চয়নের (Random Sampling) মাধ্যমে নির্বাচিত ১০টি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে সংগৃহীত। তাছাড়া, জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-২০০৩ এবং ২০০৫-২০০৬ এর তথ্য এবং পূর্বে সম্পাদিত গবেষণার তথ্যও ব্যবহার করা হয়েছে।

২। উৎপাদনশীল খাতে নারীর অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং নারী ও পুর"ষের ভিন্ন কর্মক্ষেত্র

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই উৎপাদনশীল খাতে নারী অংশগ্রহণ করে এসেছে। ইতিহাসের ক্রমবিবর্তিত প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থাতেই[১] নারীর গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। মানুষের খাদ্য সংগ্রহের প্রধান মাধ্যম যখন ছিল আহরণ ও শিকার, তখন নারীই সিংহভাগ খাদ্য আহরণ করত। অধিকন্তু শিকারেও আদিম নারীর উলেণ্ঢখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। গবাদি পশু, কুকুর ইত্যাদিকে পোষ মানানোর মাধ্যমে তখন নারী যেমন জীবনযাত্রা সহজ করে তুলেছে, তেমনি কৃষিকাজ আবিষ্কারের মাধ্যমে সভ্যতার অগ্রগতিতে অভাবনীয় ভূমিকা পালন করেছে (উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১৯৯৯)। আবার মানবজাতির বিবরণ সংক্রান্ড় মানচিত্রে দেখা যায় যে, ১৪২টি উদ্যান সমাজের (Horticulture Society) অর্ধেকেরই চাষাবাদ নারীর অধীন ছিল; ২৭ শতাংশে ছিল নারী পুর"ষের সমান অংশগ্রহণ এবং কেবল ২৩ শতাংশে পুর"ষের একক দায়িত্ব ছিল (প্রাগুক্ত)। শস্য বোনা, তোলা সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজে নারীর সম্পৃক্ততা সর্বকালীন। নারী কৃষি উপকরণ আবিষ্কারেও পালন করেছে অগ্রণী ভূমিকা। সার হিসেবে ছাইয়ের ব্যবহার, লম্বা বাটযুক্ত কোদাল, বেলচা, সাধারণ লাঙ্গল, দুই ফসলের অন্ড়বর্তীকালীন সময়ে জমি পতিত করে রাখা, শস্যচক্র, জুমচাষ ও পাহাড়ের গা কেটে জমি আবাদ করা এবং সেচ, এ সবই নারীর উদ্ভাবন। উপরন্তু ধান, যব, ভুট্টা, বার্লি, জই, মিলেট, রাই, শরগম- এই ৮টি প্রধান শস্য দানার উৎপাদন নারীই প্রচলন করেছে (প্রাগুক্ত)।

প্রাক শিল্পায়িত সমাজে নারীর গৃহশ্রম উৎপাদন ব্যবস্থার (Production Relation) একটি গুর"ত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হতো। পরিবারের ব্যবহার্য জিনিস যেমন, পোশাক এবং অন্যান্য জিনিস উৎপাদন নারীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নানা কুটিরশিল্প বিকাশ লাভ করে এবং এসব পণ্যের বিপণন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে নারীর শ্রম পারিবারিক আয়ের সম্পূরক উৎস (Complementary Source of Family Income) হিসেবে বিবেচিত হয়। শিল্প বিপণ্ঢবের সময় নারীর শ্রম সস্ড়া হবার কারণে তা উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus Value) তৈরি করতে সাহায্য করেছে। এ সময়

---

[১] মানব সভ্যতার ইতিহাসে সমাজ ব্যবস্থাকে মূলত সময় এবং কর্ম অনুসারে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :
১. শিকার ও সংগ্রহ সমাজ (Hunting and Gathering Societies)
২. উদ্যান সমাজ (Horticulture Societies)
৩. কৃষিভিত্তিক সমাজ (Agricultural Societies)
৪. প্রাক শিল্পায়িত সমাজ (Pre Industrial Societies)
৫. শিল্পায়িত সমাজ (Industrial Societies)

পরিবার বা গৃহ আর উৎপাদনের প্রাথমিক কেন্দ্র হিসেবে টিকে থাকেনি। শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে উৎপাদন গৃহের বাইরে চলে আসতে থাকে আর তার সঙ্গে সঙ্গে পুর"ষের ওপর নারীর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে শিল্পায়ন বৃদ্ধির সাথে সাথে নারীও গৃহের বাইরে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কাজ নেয়, ফলে তাদের বাইরের কাজ বেড়ে যায়। তখন থেকেই নারী ঘরে ও বাইরে এই দ্বৈত শ্রম (Dual Labour) প্রদান করতে থাকে। এই দু'ধরনের শ্রম নারীর উৎপাদনশীলতা এবং প্রকৃত কর্মঘণ্টা (Real Working Hour) কার্যত দ্বিগুণ করলেও প্রচলিত ধারণায় এই দ্বৈত শ্রম পরিসংখ্যানভুক্ত না হবার কারণে তাকে উভয় ক্ষেত্রেই কাগজে-কলমে পুর"ষের তুলনায় কম উৎপাদনশীল (Less Productive) হিসেবে দেখানোর প্রবণতা কাজ করে। এই প্রবণতাটি প্রকৃতপক্ষে নারী ও পুর"ষের ভিন্ন কর্মক্ষেত্রের ধারণা থেকে হয়েছে। নারী ও পুর"ষের কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতা আসলে একটি আপেক্ষিক ধারণা (Subjective Concept)। কারণ নারী ও পুর"ষ তাদের প্রয়োজন অনুসারে সর্বদাই শ্রম ও দায়িত্বের যথাযথ ভূমিকা পালন করেছে এবং দক্ষতা অর্জন করেছে। তাই 'কর্মক্ষেত্র' নয়, বরং কর্ম প্রকৃতির ভিন্নতা বললে বিষয়টিকে পরিপূর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব। কর্ম প্রকৃতির ভিন্নতার মৌলিক কারণ হলো, নারী ও পুর"ষের শারীরবৃত্তীয় ভিন্নতা (Physiological Difference), যা প্রকৃতিগতভাবে নারীকে সন্তান ধারণ ও পালন উপযোগী দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা আর সেবা পরায়ণতা দিয়েছে এবং পুর"ষকে দিয়েছে শক্তিমত্তা, রক্ষণের ক্ষমতা আর প্রকাশপ্রবণতা (Tendency of Expessing Oneself)। এই বিভিন্নতা আবার পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন হয়েছে। তাই শিকার সমাজেও যেমন মাতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামো পরিলক্ষিত হয়, তেমনি উদ্যান সমাজ বা কৃষিভিত্তিক সমাজেও নারীর উদ্ভাবন (কৃষিকাজ ও পশু পালন) এবং সহজাত নেতৃত্বের ক্ষমতাকে মেনে নিয়েই সভ্যতার অগ্রগতি ঘটেছে।

নারী ও পুর"ষের ভিন্ন কর্মক্ষেত্রের জন্য অনেক সময়ই বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক প্রভাবশালী তত্ত্ব বা রীতিকে (Religion-based Dominant Ideologies) দায়ী করা হয়। যেমন, ইসলাম ধর্মে নারীর অবগুণ্ঠন প্রথার মাধ্যমে তাকে গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে অন্তরীণ রাখার রীতি, সনাতন হিন্দু ধর্মে নারীর গৃহকর্ম ও পতির অনুবর্তিতার রীতি, খ্রীষ্ট ধর্মে বিবাহোত্তর পদবী পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বামীর পদবী গ্রহণ করার রীতি ইত্যাদি। অবশ্য এসব রীতির কতটুকু ধর্মে উল্লেখিত রয়েছে আর কতটুকু পরবর্তীতে ধর্ম ব্যবসায়ী আর সুবিধাভোগী সমাজপতিদের আরোপ তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তলিয়ে দেখা হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মুসলিম নারীরাও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকা"ে অংশগ্রহণ করেছেন ইসলাম প্রচার ও প্রসারের সময় থেকেই। ইতিহাস থেকে দেখা যায়, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে Turkey Aleppo এবং Cairo শহরের প্রায় প্রতিটি শ্রেণির মুসলিম নারী কোনো না কোনো অর্থনৈতিক কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। যেমন, কৃষিভিত্তিক সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মুসলিম নারীর কর্মকা"ের মধ্যে রয়েছে- বড় ব্যবসা (প্রভাবশালী মুসলিম নারী), জমি ও সম্পদ ভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবসা যেমন, বাড়ি নির্মাণ, বাড়ি ভাড়া, সুদের বিনিময়ে ঋণ প্রদান ইত্যাদি (মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলিন নারী) এবং সবজি, থালা বাসন, ডিম, র"টি, কাপড় ইত্যাদি বাজারে বিক্রয় (নিম্নবিত্ত শ্রেণির মুসলিম নারী)। প্রাকশিল্পায়িত সমাজেও মুসলিম নারীরা নানা ধরনের অর্থনৈতিক কাজ করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কায়রোর মুসলিম নারীদের উপর পরিচালিত গবেষণায় পাওয়া যায়, নারীরা সূতা এবং নাইলনের কাঁচামাল কিনে ঘরে প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রয় করতেন। এ সময়কালেই মিশর ও সিরিয়ায়

নারীরা কৃষি উৎপাদনে শ্রমশক্তির (Agricultural Labour Force) একটি উলেণ্ঢখযোগ্য অংশ হিসেবে কাজ করতেন।

একইভাবে সনাতন হিন্দু ধর্মেও নারীর পারিবারিক ও সামাজিক ভূমিকাকে সাধারণত ধারণ, লালন ও পালনে সীমাবদ্ধ করা হলেও তা আদপেই ইতিহাসসিদ্ধ নয়। কেননা তা হলে আমরা দেবী দূর্গার দুর্গতিনাশিনী রূপ, দেবী সরস্বতীর জ্ঞান ও বিদ্যা দায়িনীরূপ, কিংবা দেবী লক্ষীকে ধন দায়িনী রূপে পেতাম না। হিন্দু নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাে অংশগ্রহণকে দ্রাবির, অনার্য ও আর্য নারীর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সঙ্গে একীভূতভাবেই দেখা সম্ভব। একই কথা প্রযোজ্য খ্রীস্ট ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নারীদের ক্ষেত্রেও। এসব বিষয়ে বিস্ড়ারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার সুযোগ রয়েছে, যদিও তা বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়।

৩। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের বর্তমান চিত্র

বর্তমানে বাংলাদেশে নারীর কর্মমুখীতার বহুবিধ ক্ষেত্রের মধ্যে কয়েকটি উলেণ্ঢখযোগ্য ক্ষেত্র হলো গৃহস্থালি, কৃষিক্ষেত্র ও ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পক্ষেত্র। এছাড়া বৃহৎ শিল্প, মুদ্রণ, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, প্রশাসন ও অন্যান্য সেবাক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি বেশ কিছু অপ্রচলিত পেশাতেও নারী এগিয়ে আসছে নিজ যোগ্যতায় ও উদ্যোগে। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের এ চিত্রটি পরবর্তী আলোচনায় তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩.১. গৃহস্থালি কাজে নারীর অবদান ও তার মূল্যায়ন

গৃহকর্মে নারীর অংশগ্রহণ তাদের কর্ম সময়ের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে। গ্রামীণ নারীদের অধিকাংশই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উৎপাদন বা বাজারের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা কর্মকাে জড়িত থাকেন। যেমন জাল ও মাদুর বোনা, পাটজাত দ্রব্য ও ব্যাগ তৈরি করা, মুড়ি পিঠা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা ইত্যাদি। তবে নারীর এ ধরনের কাজের অধিকাংশই গৃহকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-০৩ এবং ২০০৫-০৬ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ সময়ের ব্যবধানে উৎপাদনশীল খাতে মোট শ্রমশক্তি ৪৪৩ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭৩ লাখ হলেও নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে মাত্র ১.৫৫ শতাংশ। অর্থাৎ এ তিন বছরের ব্যবধানে নারী মোট উৎপাদনশীল শ্রমশক্তির ২২.১২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৩.৬৭ শতাংশ হয়েছে মাত্র (সারণি ১)। তবে গত কয়েক বছরে এই বৃদ্ধির হার অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ অনুযায়ী মোট শ্রমশক্তির ৩৬ শতাংশ রয়েছে নারী শ্রম।

সারণি ১

উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত নারী ও পুর ষের সংখ্যা (লক্ষ)

বছর	২০০২-০৩	২০০৫-০৬
মোট নিয়োজিত শ্রমশক্তি	৪৪৩	৪৭৩
পুর ষ	৩৪৫	৩৬০
নারী	৯৮(২২.১২%)	১১২(২৩.৬৭%)

উৎস: জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-২০০৩ এবং ২০০৫-২০০৬।

বাংলাদেশের বসত বাড়িতে পশুসম্পদ (হাঁস, মুরগী, গর, ছাগল) প্রতিপালন ও ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে পশুপাখীকে খাওয়ানো, পরিচর্যা করা, গোয়ালঘর নির্মাণ ও পরিস্কার করা, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ প্রায় ৫০ শতাংশ থেকে ৮৫ শতাংশ। অথচ জাতীয় পরিসংখ্যানে পশুপালনে পুরষদের অংশগ্রহণই প্রাধান্য পায়। বর্তমানে বসত বাড়িতে সবজি বাগান (kitchen gardening) করার মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টি সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যায় প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষী পরিবারের নারীরা তাদের নিজ উদ্যোগে বসত বাড়ির আঙ্গিনার সবজি চাষ করে পরিবারের আয়ে অতিরিক্ত ১৫.৩০ শতাংশ অবদান রাখছেন (উন্নয়নের পদক্ষেপ, ১৯৯৯)। আত্মপোষণশীল (subsistence sector) খাতে ব্যয়িত মোট বার্ষিক সময় ৬৯,০০০ মিলিয়ন ঘণ্টার মধ্যে পুরষ কর্তৃক ব্যয়িত সময় ২৫,০০০ মিলিয়ন ঘণ্টা আর নারীর ক্ষেত্রে ৪৪,০০০ মিলিয়ন ঘণ্টা (হামীদ ১৯৮৯)। অর্থাৎ আত্মপোষণশীল খাতে নারীর অংশগ্রহণ পুরষের প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু এই তথ্য জাতীয় কোনো পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

প্রাকৃতিক নিয়মে আবহমানকাল ধরে নারী সন্তান উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত। সন্তান লালন-পালনের সিংহভাগ কাজও নারীই করে থাকেন। তাঁরা তাঁদের জীবনের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সময় (১৫-৪৫ বছর বয়স) ব্যয় করেন ভবিষ্যত প্রজন্মকে পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষা ও পেশাগতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, যা কোনো পরিসংখ্যানে আসে না। আমরা যদি বর্তমানে কেবল ঢাকা শহরে একজন বেতনভোগী গৃহকর্মী যেসব গৃহস্থালির কাজ করেন তার হিসাব নিই, তাহলে দেখা যাবে তারা যে কাজগুলো করে, একজন পূর্ণকালীন গৃহবধূ তার সবগুলোই করে থাকেন। নিচের সারণিতে এসব কাজের জন্য সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের (representative middle class family) একজন বেতনভোগী গৃহকর্মী যে উপার্জন করেন, তা দেখানো হয়েছে।

সারণি ২

গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজে একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে একজন বেতনভোগী গৃহকর্মী যে উপার্জন করে তার পরিমাণ (টাকা)

কাজের নাম	একক ব্যয় (Unit Cost) (টাকা)	মোট ব্যয় (Total Cost) (টাকা)
রান্না	১০০০	১০০০
ঘর পরিস্কার	৬০০	৬০০
কাপড় ধোয়া	৫০০	৫০০
বাচ্চাদের পড়ানো	৫০০×১০×২*	১০০০০
স্কুলে আনা-নেওয়া	১০০০	১০০০
বাজার করা	৫০০	৫০০
মোট	-	১৩৬০০

*প্রতি বিষয়ে ৫০০/- হারে ২টি সন্তানের ১০টি বিষয়ের পাঠ দানের ব্যয়।

উৎস: দৈবচয়িতভাবে নির্বাচিত ১০টি মধ্যবিত্ত পরিবারের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নির্ণীত গাণিতিক গড়। প্রাবন্ধিক কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত।

একজন সাধারণ গৃহবধূ উপরোক্ত কাজগুলোর পাশাপাশি শ্বশুরবাড়ি এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা এবং বয়োকনিষ্ঠদের তদারকিও করে থাকেন। এ সেবা যদি বর্তমান বাজার মূল্যে (current market price) কিনতে হতো তাহলে যে অর্থ ব্যয় হতো কার্যত সেই অর্থ একজন নারী তাঁর সংসারে বিনামূল্যে দিয়ে থাকেন। একইভাবে পরিবারের সদস্যদের জন্য জামা কাপড় সেলাই করেও একজন গৃহবধু তার পারিবারিক আয়ে অবদান রাখেন। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে, গৃহবধু তাঁর স্বামীর পেশায় নিয়মিত সাহায্য

করেন। যেমন যদি গৃহকর্তা ব্যবসায়ী হয়ে থাকেন এবং বাড়িতে তাঁর ব্যবসায়িক কাজ নিয়ে আসেন, সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই একজন গৃহকর্ত্রী তাঁর ব্যবসায়িক হিসাবনিকাশ দেখে দেওয়া, ফাইলপত্র সংরক্ষণ ও জনসংযোগের কাজটি করে থাকেন। আবার চাকুরিজীবী, শিক্ষক, আইনজীবী, হিসাবরক্ষক ইত্যাদি পদেও পেশাজীবীদের স্ত্রীরাও স্বামীর হয়ে খাতাপত্র দেখে দেওয়া, মক্কেলদের তালিকা ও সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা, হিসাব মেলানো এবং পেশাসংক্রান্ড় অতিথি ও ব্যবসায়িক অংশীদার আপ্যায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। এসব কাজে তাঁদের অবদান একজন ব্যক্তিগত সহকারীর (private secretary) চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। ফলে তিনি তাঁর স্বামীর অফিসের বা ব্যবসায়ের এ খরচটি (সহকারীর বেতন বাবদ ব্যয়ীতব্য অর্থ) বাঁচিয়ে দিয়ে স্বামীর উপার্জন বৃদ্ধি করছেন যা জাতীয় আয়ে স্বামীর অবদান হিসেবে অন্ড়র্ভুক্ত হয়। একজন গৃহবধুর এধরনের যাবতীয় কাজ যদি আমরা বর্তমান বাজার মূল্যে মূল্যায়িত করি তাহলে পারিবারিক আয়ে তার অবদান আরও বৃদ্ধি পায়। এ হিসাবটি নিম্নোক্ত সারণিতে দেখানো হয়েছে।

সারণি ৩

সাধারণ মধ্যবিত্ত নারীর গৃহস্থালিতে মোট অবদানের আর্থিক মূল্য

কাজের নাম	একক ব্যয় (Unit Cost) (টাকা)	মোট ব্যয় (Total Cost) (টাকা)
গৃহস্থালির কাজ (সারণি ১ থেকে)	১৩,৬০০	১৩,৬০০
বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা*	১,৫০০	১,৫০০
বয়োকনিষ্ঠদের তদারকি**	১,০০০	১,০০০
বাগান করা (Kitchen Gardening)	৫০০	৫০০
সেলাই	১,০০০	১,০০০
স্বামীর পেশায় সাহায্য	৩,৫০০	৩,৫০০
মোট	২১,১০০	২১,১০০

* এ সেবার মধ্যে পড়ে তাঁদের জন্য রান্না করা, কাপড় ধোয়া, বাজার করা, ডাক্তার দেখানো, সময়মত ঔষুধ খাওয়ানো, তাঁদের বিদ্যুৎ, টেলিফোন ইত্যাদির বিল দেয়া, তাঁদের বাড়িভাড়া তোলা, পেনশন তোলা এবং সার্বিক তদারকি ও সেবা।

** এর মাঝে রয়েছে তাদের পড়াশোনার খোঁজ রাখা, পরীক্ষার ফিস দেয়া, বই-খাতা ইত্যাদি কেনা, তাদের ও বন্ধুদের ব্যাচে বা অন্যত্র পড়ার ব্যবস্থা করা এবং আপ্যায়ন, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিভাবক মিটিং-এ অংশ নেয়া, রান্না করা, কাপড় ধোয়া, হাত খরচ দেয়া, চাকরির জন্য জীবনবৃত্তান্ড় তৈরি করা ও জমা দেয়া ইত্যাদি।

উপরোক্ত হিসাবের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত পূর্ণকালীন গৃহিণী বেকার বা কর্মহীন (unemployed) তো ননই, বরং তিনি অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর সংসারে সর্বাধিক উপার্জন করে থাকেন তাঁর কাজের মাধ্যমে পরিবারের ব্যয় বাঁচিয়ে। অথচ এ খাত সর্বদাই জাতীয় আয়ে উপেক্ষিত থেকে যায়।

ঘরের বাইরে নিয়োজিত একজন কর্মজীবী নারী উলেণ্ঢখিত সবগুলো কাজ একজন পূর্ণকালীন গৃহিণীর মতো এককভাবে নিজে না করলেও গৃহকর্মী, গৃহশিক্ষক এবং সেবিকার সাহায্যে সম্পাদন করেন। এইসব সেবা প্রদানকারীগণের মাসিক বেতন অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজেই দিয়ে থাকেন। যেসব কর্মজীবী নারী গৃহে এসব সহায়তা গ্রহণের জন্য আর্থিক সামর্থ্য রাখেন না এবং যাঁদের স্বামী-সন্ড়ান, শ্বশুড়-শাশুরি, দেবর-ভাসুর, ননদ-জা 'অন্যের হাতের রান্না' খেতে বা 'বাইরের লোকের সেবা' নিতে নারাজ, তাঁদের এই কাজগুলো নিজেদেরই করতে হয়। নয়তো পুরো তদারকির দায়িত্ব নিতে হয়।

অথচ একজন কর্মজীবী নারীর কেবল বাইরের কাজে উপার্জিত বেতনটুকুই জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানভুক্ত হয়।

এই আলোচনায় অত্যন্ড় মোটা দাগে পরিবার ও সমাজে নারীর অবদানের আর্থিক মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু একজন নারী কন্যা, মা, স্ত্রী, বধূ বা ভাবী হিসেবে এ কাজগুলো যখন করেন তখন তাতে জড়িয়ে থাকে তাদের মমত্ববোধ, সেবা ও যত্ন, যা কোনো আর্থিক মূল্যে গৃহিণীর এই কাজগুলো মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। 'মূল্যহীন' (free) এবং 'অমূল্য' (priceless) শব্দ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কেবল উপসর্গ-অনুসর্গের হলেও এর অন্ড়র্নিহিত অর্থের পার্থক্য আকাশ পাতাল। কেননা, নারীর এই 'অমূল্য' অবদানগুলো পরিবারের সদস্যদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, যা আবার জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে মা যদি সন্ড়ানকে টিউটরিং করেন তাহলে সে সন্ড়ানের পরীক্ষার গ্রেড গৃহশিক্ষকের কাছ হতে যে সন্ড়ান টিউটরিং পায় তার চেয়ে অনেক ভালো হয় (Paul-Majumder 1986)। জাতীয় আয়ে নারীর অবদান যথাযথভাবে নির্ণয়ের জন্য এ 'অমূল্য' অবদানগুলোর মূল্যায়ন অপরিহার্য।

৩.২। কৃষিক্ষেত্রে নারীর অবদান

উন্নয়নশীল দেশের নারীরা সকল প্রকার কৃষি উৎপাদনের ৪০ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ (দেশভেদে পৃথক) দায়িত্ব পালন করেন। শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-২০০৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে কর্মরত নারীর ৫৮.৬ শতাংশ কৃষিখাতে এবং ৪১.৪ শতাংশ অন্যান্য খাতের কর্মে নিয়োজিত আছেন। শ্রমশক্তি জরিপ ২০০৫-০৬-এ দেখা যায় কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের সংখ্যা ১০ শতাংশ বেড়ে ৬৮.১৩ শতাংশ হয়েছে। অর্থাৎ একই সময়ে অন্যান্য খাতে কর্মরত নারীর সংখ্যা একই পরিমাণে কমে ৩১.৮৭ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, কৃষিকর্মে নারীর অবদান ক্রমাগত বেড়ে চলেছে (লেখচিত্র ১)।

লেখচিত্র ১
কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারী কর্মসংস্থান (লাখ)

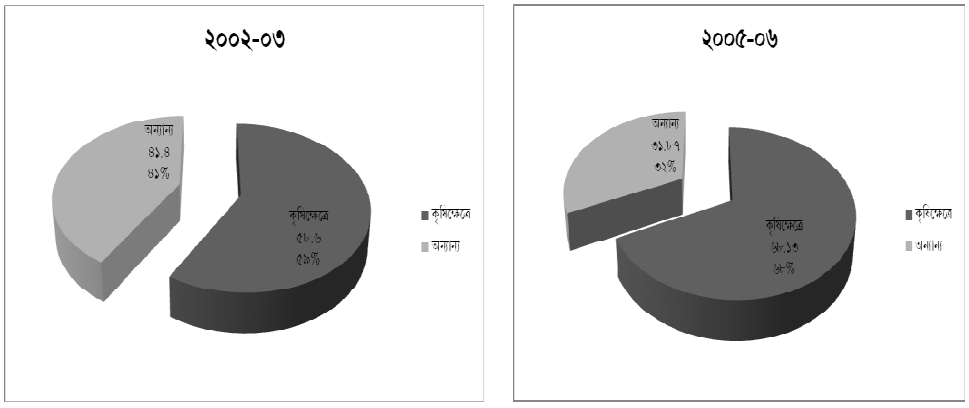

উৎস: জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-২০০৩ এবং ২০০৫-২০০৬।

বাংলাদেশে গ্রামীণ নারীর ৭৩.৬ শতাংশ কৃষিতে কাজ করেন। সময়ের পরিমাপ এবং গুর"ত্বের দিক বিবেচনায় কৃষিক্ষেত্রে নারীর অংশীদারিত্ব কোনোভাবেই পুর"ষের চেয়ে কম নয়। বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে নারী বীজতলা তৈরি থেকে আরম্ভ করে ফসল প্রক্রিয়াজাত করা প্রতিটি কাজে অংশগ্রহণ করেন। কোনো কোনো ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারী ৭০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশ কাজ করেন। যেমন আলু, ভুট্টা, মরিচ ইত্যাদি। কিন্তু নারী জমির মালিক নন বলে তিনি পরিসংখ্যানে কৃষক হিসাবে অন্ড়র্ভুক্ত হননা। ফসল ও বীজ সংরক্ষণে নারী প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। বীজ উৎপাদনে এবং উদ্ভাবনেও নারীর অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। এছাড়া পূর্বেই উলেণ্ঢখ করা হয়েছে পশু ও হাঁস মুরগির যত্ন নেয়া, শাকসবজি উৎপাদন ইত্যাদি কাজে রয়েছে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। কিন্তু কৃষিতে তাদের এই ব্যাপক অংশগ্রহণের বেশিরভাগটাই স্বীকৃতিহীন। কেননা কৃষিক্ষেত্রে নারী সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকার পরও কৃষক কিংবা কৃষি শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেননি। ফলে দেশের জাতীয় আয়ে তাদের এই অবদানও স্বীকৃতিহীন।

৩.৩। শিল্পক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও জাতীয় আয়ে অবদান

৩.৩.১। কুটির শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ ও অবদান

আবহামানকাল ধরেই বাংলাদেশে কুটির শিল্পে নারীর সম্পৃক্ততা রয়েছে। চুন তৈরি, ঠোংগা তৈরি, বাঁশ ও বেত শিল্প, তাঁত বোনা, জাল বোনা, ছোবড়া শিল্প, মাদুর বোনা শিল্প ইত্যাদিতে নারীর উলেণ্ঢখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। UNICEF-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী চুন তৈরির মতো অত্যন্ড় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিতদের বেশির ভাগই (৬৮ শতাংশ) মহিলা। এছাড়া নকশী কাঁথা তৈরি, কাঁচ, মোম, শোলা ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন শৌখিন সামগ্রী তৈরির শিল্পে, বণ্ঢক বাটিক, টাই ডহি ইত্যাদি শিল্পে প্রায় এককভাবে নারী অবদান রেখে যাচ্ছেন। নব্বইয়ের দশক থেকে "বুটিক" শিল্পের মাধ্যমে যে নব জাগরণ এসেছে তাতে কুটির শিল্পে নারীর সম্পৃক্ততা বেড়েছে বহুগুণে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কুটিরশিল্পে নারীর কাজগুলোকে নারীর গৃহস্থালি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ফেলা হয়। ফলে কুটিরশিল্পে নারীর এই বিস্তৃত অংশগ্রহণ একদিকে যেমন জাতীয় পরিসংখ্যানে অন্ড়র্ভুক্ত হয় সামান্যই, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় আয়েও নারীর এই অবদান স্বীকৃতি পায় সামান্যই।

অবশ্য গত কয়েক বছরে কুটির শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ হ্রাস পাচ্ছে। শ্রমশক্তি জরিপ ২০০৫-০৬-এ দেখা যায়, কুটির শিল্পে নিয়োজিত মোট শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে ২৬.২২ লাখ হলেও নারী শ্রমিকের সংখ্যা নেমে গিয়েছে ৯.৬৮ লক্ষে। অন্যদিকে পুর"ষ শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় একই পরিমাণ (প্রায় ৫ লাখ) বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ৪)। এর কারণ সম্ভবত শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি নানা ধরনের নারীবান্ধব কর্মসূচির (women-friendly) ফলে কুটির শিল্প খাতে নিয়োজিত নারীদের অনেকেই আনুষ্ঠানিক খাতে (Formal Sector) কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। কুটিরশিল্পে নিয়োজিত অনেক নারী তাঁদের ব্যবসায়িক সাফল্যের কারণে কারখানা বর্ধিত করে ক্ষুদ্র শিল্পের (small Industry) পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া কুটির শিল্পে নিয়োজিত নারীরা উদ্যোগ এবং প্রশিক্ষক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে অনেক পুর"ষেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

সারণি ৪

কুটির শিল্পে নারী-পুরুষের তুলনামূলক কর্মসংস্থান (লাখ)

	২০০২-০৩	২০০৫-০৬
মোট	২৫.৪৯	২৬.২২
পুরুষ	১১.৩৬	১৬.৫৪
নারী	১৪.৩৬	৯.৬৮

উৎস: জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-২০০৩ এবং ২০০৫-২০০৬।

৩.৩.২। বৃহৎ শিল্পে নারীর অংশগ্রহণের ব্যাপ্তি

কেবল কুটির শিল্পেই নয়, দেশের বিভিন্ন বৃহৎ শিল্পেও নারীরা অংশ নিচ্ছেন অধিক থেকে অধিকতর হারে। জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী ১৯৮৬ সালের পর শিল্পখাতে পুরুষ শ্রমিকের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি না পেলেও মহিলাদের অংশগ্রহণের হার উলেণ্ঢখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী শ্রমিক অধ্যুষিত শিল্পগুলো হচ্ছে পোশাক শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, বিশেষত চিংড়ি শিল্প এবং ঔষধ শিল্প। তাছাড়া চা শিল্প এবং রেশম শিল্পও নারী শ্রমিক অধ্যুষিত। পোশাক শিল্পে নিয়োজিত মোট শ্রমিকের মধ্যে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশই হচ্ছে নারী শ্রমিক।

তবে বৃহৎ শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকরা নানাভাবে নির্যাতিত হয়। যেমন পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাদেরকে দৈনিক ১২ ঘণ্টার বেশি শ্রম দিতে হয়। তার উপর একজন নারী শ্রমিককে বাড়ি ফিরে গৃহস্থালির কাজও সামলাতে হয়। নারী শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রম (surplus labour) মালিকের মুনাফার মূল উৎস হলেও তাঁর গড় আয় জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের (subsistence level) নিচে। তাছাড়া শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে মজুরিসহ নানা বিষয়ে ব্যাপক লিঙ্গ বৈষম্য। এই ব্যাপক বৈষম্যের কারণে জাতীয় আয়ে শিল্প ক্ষেত্রে নারীর অবদান সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, পোশাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের পুরুষ শ্রমিকদের মতো সমান গুণাগুণ (যে গুণগুলো মজুরি নির্ধারণে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখে) থাকা সত্ত্বেও লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে পুরুষ শ্রমিকের চাইতে প্রায় ৩৫ শতাংশ মজুরি কম পায় (Paul-Majumder and Begum 2006)। ফলে জাতীয় আয়ে নারী শ্রমিকের অবদানও পুরুষ শ্রমিকের চাইতে কম হয়। শিল্পখাত ব্যতীত অন্যান্য ফর্মাল সেক্টরে নারী পুরুষের মজুরির মাত্র ৫২ শতাংশ পায় এবং ইনফর্মাল সেক্টরে পায় প্রায় ২৯ শতাংশ (Paul-Majumder 2003)। অথচ কৃষি ও অকৃষি উভয় শ্রমেই নারীর প্রকৃত অবদান পুরুষের তুলনায় কম নয়।

বৃহৎ শিল্পে নিয়োজিত নারী ও পুরুষ কর্মীদের মধ্যে আরও একটি যে লিঙ্গ বৈষম্য জাতীয় আয়ে নারীর অবদানকে কমিয়ে দিয়েছে তা হলো পদন্নোতিতে লিঙ্গ বৈষম্য। শিল্প ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পোশাক শিল্পক্ষেত্রে যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মী হচ্ছে নারী সেখানে উচ্চপদে অতি নগণ্য সংখ্যক নারী কর্মী রয়েছে। অথচ দেখা গেছে উচ্চপদে নিয়োজিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাগুণ অনেক নারী কর্মীরই আছে। একই চিত্র অন্যান্য শিল্পেও দেখা যায়। এর পেছনে নারী তার নিজের স্বচ্ছন্দ গণ্ডির (comfort zone) বাইরে অধিকতর দায়িত্বশীল পদে কাজ করতে অনাগ্রহ একটি প্রধান কারণ হলেও নিয়োগকর্তাদের পদোন্নতি দেবার বেলায় নারী কর্মীদের চাইতে পুরুষ কর্মীদের বেশি পছন্দ করবার প্রবণতাই সবচাইতে প্রভাবশালী কারণ। এই কারণটির পেছনে যেসব যুক্তি কাজ করে তা হলো একজন

নারী অনেক সময়ই বৈবাহিক ও সন্তান ধারণজনিত কারণে কর্মে ছেদ দিতে পারেন, যে সম্ভাবনা একজন পুরুষের ক্ষেত্রে কম। আর অধিক দায়িত্বশীল পদে এ ছেদ তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করা নিয়োগকারীদের জন্য কষ্টকর। তবে নারীদের দরকষাকষির ক্ষমতা (Bargaining Power) কম। যার ফলে তারা কর্মক্ষেত্রে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়।

৩.৩.৩। চা ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে নারীর অবদান

চা শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প। এ শিল্পেও নারীর অংশগ্রহণ উলেণ্টখযোগ্য। বাগান থেকে চা পাতা তোলার মূল কাজটি করে নারীরা, যাদের সংখ্যা মোট শ্রমিকের ৫২ শতাংশ (পারভেজ ২০০০)। তবে চা উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে (দেখুন সারণি ৫)।

চা, কফি ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন এবং চা, কফি মিশ্রণে (Blending) ২০০২-০৩ হতে ২০০৫-০৬ সময়কালে নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-০৩-এ চা, কফি ও অন্যান্য শস্য উৎপাদনে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ প্রায় সমান ছিল (যথাক্রমে ৫২ ও ৪৮ শতাংশ), সেখানে ২০০৫-০৬-এ মোট শ্রমিকের (৪৩১৩৪৯ জন) ৮৯.১৮ শতাংশ (৩৮৪৬৭৮ জন) হলো নারী এবং মাত্র ১০.৮৯ শতাংশ (৪৬৬৭১ জন) পুরুষ। একইভাবে ২০০২-০৩ অর্থবছরে চা, কফি মিশ্রণে নিয়োজিত সব পুরুষ শ্রমিকের (৮১৫ জন) বিপরীতে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৪৬,১৭৯ জন নারী নিযুক্ত হয়েছেন, যা মোট শ্রমিকের (১০৭৪৩৭ জন) ৪২.৯৮ শতাংশ। সুতরাং স্বল্প সময়ের ব্যবধানে চা শিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যার এই উর্ধ্বগতি অর্থনৈতিক খাতে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের অন্যতম নির্দেশক। তবে ব্যাপক শোষণের কারণে নারী চা শ্রমিকেরা তাদের অবদান অনুযায়ী মজুরি পাচ্ছে না। যার ফলে জাতীয় আয়েও তাদের অবদান কম প্রতিফলিত হয়।

সারণি ৫

চা শিল্পের বিভিন্ন খাতে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা (১৫ বছর ও তার উর্ধ্বে)

বছর	শিল্পের বিবরণ	মোট শ্রমিক (নারী ও পুরুষ)	পুরুষ	নারী
২০০২-০৩	চা, কফি উৎপাদন ও অন্যান্য শস্য	৩১২,১৬৭	১৪৭,৮৩৪	১৬৪,৩৩৩
	চা, কফি প্রক্রিয়াকরণ	২৪,২০৬	১৩,৬১২	১০,৫৯৮
	চা, কফি মিশ্রণ (Blending)	৮১৫	৮১৫	০
২০০৫-০৬	চা, কফি ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন	৪৩১,৩৪৯	৪৬,৬৭১	৩৮৪,৬৭৮
	চা, কফি মিশ্রণ	১০৭,৪৩৭	৬১,২৫৮	৪৬,১৭৯

উৎস: জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-২০০৩ এবং ২০০৫-২০০৬।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে নারী ব্যাপকভাবে নিয়োজিত। বাংলাদেশের অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প হলো চিংড়ি শিল্প। এ শিল্পের ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোও নারীরাই অধিক সংখ্যায় করে থাকেন। সামুদ্রিক মৎস্য শিল্পে ১২৭৮, অভ্যন্তরীণ মৎস্য শিল্পে ৭৭৯৭ (চিংড়ি শিল্প ছাড়া), এবং মৎস্য সংক্রান্ত সেবা খাতে ৮১৫ সংখ্যক নারী (১৫ বছর ও তার উর্ধ্বে) কর্মরত রয়েছেন (শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-০৩)। আবার শ্রমশক্তি জরিপ ২০০৫-০৬-এর হিসাব অনুযায়ী ঐ অর্থবছরে সামুদ্রিক ও উপকূলবর্তী মৎস্য শিল্পে (কোড ০৫০১) নিয়োজিত নারীশ্রমিকের সংখ্যা ১,৯৭০,

অভ্যন্ড়রীণ মৎস্য শিল্পে ১২৭,৭৯০ (চিংড়ি শিল্প ছাড়া) (কোড ০৫০২), চিংড়ি শিল্পে (কোড ০৫০৩) ৯৮০, মৎস্য চাষ ও অন্যান্য জলসম্পদে (কোড ০৫০৮) ৪০,৩৬৯ এবং মৎস্য সংক্রান্ড় সেবা খাতে (কোড ০৫০৮) ৬২,১৪৬ জন নারী (১৫ বছর ও তার ঊর্ধ্বে) কর্মরত রয়েছেন (শ্রমশক্তি জরিপ ২০০৫-০৬)। এই কাজগুলোই মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সিংহভাগ জুড়ে আছে। কিন্তু এই শিল্পেও নারী তার ন্যায্য মজুরি পায় না। ফলে আর্থিক মূল্যায়নে এই ক্ষেত্রেও নারীর অবদান স্বল্প করে দেখানো হয়। এমনিভাবে শিল্পক্ষেত্রে নারীর অবদান জাতীয় আয়ে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না।

৩.৪। সেবাখাতে নারীর অংশগ্রহণ ও অবদান

৩.৪.১। সাংবাদিকতায় নারীর অংশগ্রহণ ও অবদান

সাংবাদিকতা পেশায় বর্তমানে ব্যাপক হারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক সংবাদপত্র তথা প্রিন্ট মিডিয়া ছাড়াও বর্তমানে টেলিভিশন সাংবাদিকতায় পুরুষের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক নারী নিয়োজিত আছেন। ১৯৯২-৯৩ সালে প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় ৫১টি দৈনিকে পুরুষের বিপরীতে মাত্র ১.৪ শতাংশ মহিলা সাংবাদিক রয়েছেন। অথচ এ সংখ্যা বর্তমানে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে পাশ করে প্রতিবছর প্রায় সমান সংখ্যক পুরুষ ও নারী কর্মক্ষেত্রে আসছেন। এদের মধ্যে যারা সরাসরি সাংবাদিকতায় নিয়োজিত হচ্ছেন তাদের মধ্যে পুরুষের বিপরীতে নারীর সংখ্যা প্রায় সমান। বিজ্ঞাপন, প্রকাশনা এবং অন্যান্য খাতেও নারীরা পুরুষের পাশাপাশি নিয়োজিত হচ্ছেন। ফলে সাংবাদিকতায় নারীর অংশ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৫.৪৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে সংবাদ সংগ্রাহকদের মধ্যেও নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে যেমন নারীরা সাংবাদিকতা ও টিভি রিপোর্টার হিসেবে কেবল সাংস্কৃতিক পাতা জুড়ে থাকতেন, বর্তমান চিত্র তার বিপরীত। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, চাঁদাবাজ, রাজনৈতিক ও আইনগত বিষয় এমনকি খেলাধুলা-সাংবাদিকতায়ও রয়েছে নারীর দৃপ্ত পদচারণা। তবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায়) বাংলাদেশের নারীদের উল্লেখযোগ্য অবদান থাকলেও বৈষম্যমূলক আচরণ, নিম্ন বেতন কাঠামো এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক (Socio-Cultural) অবমূল্যায়নের কারণে এইক্ষেত্রেও তাদের অবদান সার্বিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। তাছাড়া নারীরা সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবমূল্যায়নের কারণে দীর্ঘসময় এ পেশায় থাকতেও পারেন না (BulBul, 2000)। এই ক্ষেত্রে নারীদের সঙ্কুচিত কর্মজীবনের কারণে তাদের প্রতিভা এবং সম্ভাবনারও পূর্ণ বিকাশ হয় না। যা জাতীয় আয়ে তাদের অবদানকে কমিয়ে দেয়।

৩.৫। প্রশাসনে এবং সরকারি অন্যান্য পদে নারীর অংশগ্রহণ

সরকার বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নিয়োগদানকারী। প্রশাসনে এবং সরকারি বিভিন্ন পদে নারীরা বর্তমানে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত আছেন, নারীদের জন্য গেজেটেড পর্যায়ে ১০ শতাংশ এবং নন-গেজেটেড পর্যায়ে ১৫ শতাংশ কোটা নির্দিষ্ট রয়েছে। তবে কম সংখ্যক ক্ষেত্রে এ কোটা পূরণ হয়েছে। ফলে সরকারি চাকরিতে নারীর অংশগ্রহণ এখনও সন্তোষজনক পর্যায়ে নয়। সরকারি চাকরিতে নারীর মোট অংশগ্রহণ মাত্র ১০ শতাংশ এবং প্রথম শ্রেণি (Class-I) ও দ্বিতীয় শ্রেণির (Class-II) পদে মাত্র ৮

শতাংশ (Kashem et.al. 2002)। মোট ২৯টি ক্যাডারে নারীরা প্রধানত নিম্নপদে চাকরিরত। প্রশাসনের উচ্চতর পদে এবং নীতিনির্ধারণে তাঁদের অংশগ্রহণ এখনও উল্লেখযোগ্য নয়।

কোটা দিয়েও খোদ মন্ত্রণালয়গুলোতেও নারীর যথাযথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি। তবে মন্ত্রণালয় ভেদে এ চিত্রের ভিন্নতা রয়েছে। কোটা পূরণে পিছিয়ে থাকা মন্ত্রণালয়গুলো হচ্ছেঃ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় (১.৭৭%), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (২.০৭%), কৃষি মন্ত্রণালয় (২.৫৯%) এবং মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় (৩.৩৮%) (পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০০৪)। অন্যদিকে মহিলা মন্ত্রণালয় ছাড়া কোটা পূরণে এগিয়ে থাকা মন্ত্রণালয় এবং বিভাগগুলো হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় (২৪.০৪%), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (২৭.৪১%) এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (২২.০৩%)। একমাত্র ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কোনো নারী কর্মরত নেই (২০০১ সালের হিসাব অনুযায়ী, সূত্রঃ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০০৪)। প্রশাসন ক্ষেত্রেও ব্যাপক লিঙ্গ বৈষম্য, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবার অবর্তমানে নারী তার সম্ভাবনা ও প্রতিভার প্রকাশ ঘটাতে পারছেন না। যার ফলে জাতীয় আয়েও তাদের সঠিক অবদানের প্রতিফলন হয় না। প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী যতটুকুই নিয়োজিত আছেন ততটুকুতে তারা দক্ষতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছেন। উচ্চতর সরকারি পদ, ব্যাংক, বীমা, মন্ত্রীপরিষদ, পুলিশ সার্ভিস, রাজস্ব খাত সর্বত্রই কম সংখ্যায় হলেও নারীর রয়েছে দৃপ্ত পদচারণ। তবে কোথাও তারা তাদের অবদানের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না যা জাতীয় আয়ে তাদের অবদানকে ছোট করে রেখেছে।

৩.৬। ক্ষুদ্রঋণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রক্রিয়ায় নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণে গ্রাম অঞ্চলে এক বিরাট কর্মজগৎ সৃষ্টি হয়েছে যা জাতীয় আয়ে এক বিশেষ অবদান রেখেছে। ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধা পেয়ে লাখ লাখ গ্রামীণ নারী নতুন নতুন পণ্য তৈরি করেছেন যা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে। তারা হাজার হাজার কর্মও সৃষ্টি করেছেন। তাদের সফলতা বাংলাদেশকে নোবেল পুরস্কার বিজয়ের গৌরব এনে দিয়েছে। কিন্তু এই সফলতার উপর নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই যেহেতু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রঋণ উদ্ভূত কর্মকা চালানোর জন্য তাদের পুর ষের উপর নির্ভর করতে হয়। দেখা গেছে, তার নিয়ন্ত্রণ নেই তার ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কেনার উপর; তার নিয়ন্ত্রণ নেই তার ব্যবসা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যের উপর; তার নিয়ন্ত্রণ নেই তার ব্যবসা লব্ধ মুনাফার উপর। ফলে জাতীয় আয়ে ক্ষুদ্রঋণ উদ্ভূত অবদানের অনেকটাই পুর ষের অবদান হিসেবে পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্ষুদ্র ব্যবসা সম্পর্কিত কোনো সহায়ক সেবা নেই বলেই নারী তার অবদানের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন না। ক্ষুদ্রঋণ প্রক্রিয়ার শুর থেকেই নারীরা তাদের গৃহীত ঋণের প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে পুরোপুরি পরিশোধ করেছেন। পরবর্তীতে তারা আরও বৃহত্তর ঋণ নিয়েছে এবং নিজেদের পাশাপাশি পরিবারের ও আশেপাশের মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

৩.৭। অন্যান্য অপ্রচলিত পেশায় নারীর অংশগ্রহণ

বর্তমানে অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুর ষের পাশাপাশি নারীরাও অংশগ্রহণ করেছেন। নানা ধরনের অপ্রচলিত পেশায়ও নারীরা অংশগ্রহণ করে তাদের চ্যালেঞ্জিং কাজের প্রতি আগ্রহকে প্রকাশ করছে। বিচারপতি, উকিল, ট্রাফিক পুলিশ, নিরাপত্তা প্রহরী, ফার্ম ও বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রির সরবরাহকারী, সেনাবাহিনী, ড্রাইভিং, রিকশা-পেইন্টিং, মৃতদেহ সৎকার সংক্রান্ড়, ব্যবসা, রেডিও, চাবি তৈরি ও ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি ধার দেয়ার কাজ, ধাত্রীর কাজ, টিভির মেকানিক, শিপিং

ম্যানেজমেন্ট, কেমিস্ট, তবলা বাদক, ভিডিও ক্যাসেট এবং অন্যান্য বিনোদন সামগ্রি ভাড়া খাটানো, অর্থ সংক্রান্ড় মধ্যস্থতাকারী, জীবন বীমা ও অন্যান্য বীমা, হেয়ার ড্রেসিং এবং অন্যান্য রূপসজ্জাজনিত কাজ, অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক, সিনেমা হলে প্রজেক্শন, চলচ্চিত্র উৎপাদন ও বিতরণ ইত্যাদি শত রকমের ঝুঁকিপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীরা অংশগ্রহণ করছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, প্রাথমিক পর্যায়ে মাদ্রাসা ও অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষাদান ক্ষেত্রেও (BSIC,৪-ডিজিট কোড) নারী প্রায় ২০ শতাংশ হারে অংশ নিচ্ছে। অর্থাৎ মৌলবাদ এবং ধর্মীয় গোঁড়ামীকেও নারীর কর্মে অংশগ্রহণ প্রতিহত করতে পারেনি। সামাজিক পরিমন্ডল যদি নারীর প্রতি উদার হতো তাহলে বিভিন্ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি পেতো এবং জাতীয় আয়ে নারীর অবদান বৃদ্ধি পেতো কয়েকগুণ।

জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ ২০০৫-০৬-এ (BSIC, ৪-ডিজিট কোডে) আরও দেখা যায়, জাহাজভাঙ্গা এবং বিচ্ছিন্নকরণ শিল্পের মোট শ্রমশক্তির ৮২.৪০ শতাংশ হলো নারী (কোড-৩৫১৩)। যান্ত্রিক যানবাহন নির্মাণ শিল্পের (কোড-৬৫২৪) ৩৮.১৮ শতাংশ শ্রমিক নারী। একইভাবে অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি তৈরি, জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত, সাইকেল ও রিকশা মেরামত, ভবন নির্মাণ ও সমাপ্তকরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ, কাঠ চেরাই ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, বৈদ্যুতিক মেরামত, রেলওয়ে, সড়ক নৌপথ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং, আর্থিক বিনিময় ও ঋণদান এবং জীবনবীমা খাতে নারীর অংশগ্রহণ উলেণ্টখযোগ্য ও ক্রমবর্ধমান।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে নারীর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের একটি বহুমুখী চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু জাতীয়ভাবে এখনও আরও বহুক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ স্বীকৃত হয়নি, যদিও সেসব ক্ষেত্রে নারী অংশগ্রহণ রয়েছে। শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-২০০৩-এ (BSIC,৪-ডিজিট কোড অনুযায়ী) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাটা প্রসেসিং (কোড-৭২৩০), সফটওয়্যার কনসাল্‌ট্যান্সি, স্থাপত্য, প্রকৌশল এবং এ সংক্রান্ড় টেকনিক্যাল, কনসাল্‌ট্যান্সি, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটসমূহ শ্রমিক নিয়োগ, একাউন্টিং, বুক-কিপিং, ট্যাক্স আদায় ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্সি ইত্যাদি খাতে নারীর অংশগ্রহণ শূন্য দেখানো হয়েছে, যদিও এসব ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ রয়েছে। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে নারীর অবদান স্বীকৃতি পায়নি।

ঐ একই জরিপে (শ্রমশক্তি জরিপ ২০০৫-০৬) আরও যেসব খাতে নারীর শূন্য অংশগ্রহণ দেখানো হয়েছে, সেগুলো হলো (BSIC, ৪-ডিজিট কোড অনুযায়ী) তুলা এবং উল প্রক্রিয়াজাতকরণ (কোড-১৭২৫, ১৭২৬), ফুটওয়্যার তৈরি, লাগেজ, হ্যান্ডব্যাগ ও হার্নেস তৈরি, ধাতব ট্রাঙ্ক, নাট-বল্টু, ব্যারেল ও ড্রাম তৈরি, ধাতু ও ধাতব দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কোটিং, ইঞ্জিন, টার্বাইন এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যবহার্য ভারী যন্ত্র তৈরি, হিসাবরক্ষণ ও কম্পিউটিং যন্ত্র তৈরি, যান্ত্রিক মোটর, জেনারেটর ও টার্বাইন তৈরি, বৈদ্যুতিক তার (ইনসুলেটেড ও কেবল) তৈরি, বৈদ্যুতিক বাল্ব, টিউব ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি তৈরি, টেলিভিশন, রেডিও ও অন্যান্য প্রচারমূলক যন্ত্রাংশ তৈরি এবং পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ, পরীক্ষণ ও নেভিগেটিং এর যন্ত্রাদি নির্মাণ। অথচ এসব খাতের অনেকগুলোতেই আমরা নারীর অংশগ্রহণ দেখতে পাই। একইভাবে দেখা গেছে, নারী মুদি দোকান, চায়ের দোকান, সেলুন, সাধারণ বিপণী বিতানে বিক্রেতা, মোবাইল ফোন বিক্রয়, বিক্রয়োত্তর সেবাদান, রিচার্জ ও কম্পিউটার তৈরি ইত্যাদি খাতেও এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু এসব খাতে নারীর অংশগ্রহণ পরিসংখ্যানের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এসব ক্ষেত্রের অবদান স্বীকৃতি পেলে জাতীয় আয়ে নারীর অবদান আরও বৃদ্ধি পেতো।

৪। উপসংহার

এ প্রবন্ধের আলোচনায় এবং পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, দেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপক এবং আরও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা তাদের মধ্যে আছে। সুযোগসুবিধার অভাবে এবং নারী-বান্ধব পরিবেশের অভাবে নারীগোষ্ঠী তার প্রতিভা এবং সম্ভাবনা উৎপাদনশীল কাজে লাগাতে পারছেন না। ফলে জাতীয় আয়ে নারীর অবদান হয় স্বল্প। তার উপর যতটাই তারা অবদান রাখে তারও যথাযথ স্বীকৃতি থাকে না। ফলে জাতীয় পরিসংখ্যানেও অন্ড়র্ভুক্ত হয় না। তাদের বহু অবদানের আবার আর্থিক মূল্যায়নও হয় না। তাছাড়া কর্মক্ষেত্রে নানা বৈষম্যের কারণে নারী তার ন্যায্য পাওনা হতে বঞ্চিত হয়। যার ফলে জাতীয় আয়ে তার সঠিক অবদান প্রতিফলিত হয় না। তাছাড়া অধিকাংশ সময় নারীকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কম উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করা হয়। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নারীর অসহায়ত্বের কারণে তারা নিজেদেরই যে কোনো রকম শ্রমে কম মজুরিতে নিয়োজিত হবার প্রবণতা থাকে। তাদের কম দরকষাকষি করবার ক্ষমতার (Low Bargaining Power) কারণেও তারা কম সুযোগ-সুবিধা পায়। অন্যদিকে পরিসংখ্যানগত সমস্যার কারণে নারীর অংশগ্রহণ পূর্বের তুলনায় অনেক বাড়লেও তা দৃশ্যত অর্থনীতিতে অন্ড়র্ভুক্ত হচ্ছে না। এর পেছনে নারীর প্রতি পুর"ষতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী সমাজের উন্নাসিকতা দায়ী। World Economic Forum (WEP) পরিচালিত লিঙ্গবৈষম্য (Gender Gap) সংক্রান্ড় ৫৮টি দেশের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এ বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২৯তম স্থানে রয়েছে (Gender Equity, ১৭ মে ২০০৫)। এ বৈষম্য আরও কমিয়ে আনা না গেলে নারী অর্থনীতিতে যে উলেণ্ঢখযোগ্য অবদান রাখছে, তা ক্ষতিগ্রস্ড় হবে, যা সার্বিক অর্থনীতির ক্ষেত্রেও মঙ্গলজনক হবে না। নারী উদ্যোক্তাদেরকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হলে নারীর অবদান এবং কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণের সুযোগ বেড়ে যাবে বহুগুণে। ফলে দেশে সার্বিক উন্নয়ন আরও বেগবান হবে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে।

তাই দেশ ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের যথাযথ মূল্যায়ন অপরিহার্য, কেননা তা না হলে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে যেমন অবমূল্যায়িত করা হবে, তেমনি অনেক সম্ভাবনার দ্বার রয়ে যাবে র"দ্ধ। জাতীয় আয়ে নারীর অবদানকে পরিসংখ্যানভুক্ত করতে সংশিণ্ঢষ্ট কর্তৃপক্ষ, নিয়োগকারী সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, দাতাগোষ্ঠী, নীতিনির্ধারক, গবেষক, উদ্যোক্তা, সমাজকর্মী- সর্বোপরি জনগণকে আরও সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আর তা হলেই অনেক প্রতিবন্ধকতাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করে তা দূর করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতিতে তা নিশ্চিতভাবে সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

গ্রন্থপঞ্জি

হামীদ, শামীম (১৯৮৯): "নারীদের গৃহস্থালী কর্মকা" এবং জিডিপি'র হিসাব : কিছু প্রসঙ্গ কিছু অনুসঙ্গ," *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, ৭ম খ", বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)।

সুলতানা, পারভীন (১৪০৮): "কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশের মহিলাদের অংশগ্রহণ : একটি পর্যালোচনা," *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, ঊনবিংশ খ", বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)।

উন্নয়ন পদক্ষেপ (১৯৯৭): ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ।

পারভীন, শামীমা (১৯৯৯): "কৃষিতে নারী : অবদান ও প্রাপ্তি," উন্নয়ন পদক্ষেপ, এপ্রিল-জুন, ৫ম বর্ষ, ষষ্ঠদশ সংখ্যা।

মজুমদার, প্রতিমা পাল ও জহির, সালমা (১৯৯০): বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে শ্রমিকের অবস্থা, একতা পাবলিকেশনস।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০০৪, ২০০৫ এবং ২০০৮ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা।

রহমান, শাহীন (১৯৯৮): "জেন্ডার প্রসঙ্গ," স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট।

বিভিন্ন সংবাদপত্র ও গেজেট থেকে সংকলিত।

আহ্মেদ, হোমায়রা (২০০৭): "বাংলাদেশের নারী: কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও যথাযথ মূল্যায়ন শীর্ষক একটি পর্যালোচনা," সেলিনা হোসেন, ঋতা আফসার ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত "জেন্ডার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন", মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

Bulbul, Parvez (2010): "Women in Media in Bangladesh," Sub-editorial, 8 August 2010, *The Daily Star.*

Hamid, Shamim (1986): "Women's Non-Market Works and GDP Accounting: The Case of Bangladesh," *Research Report*, No.110, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

Jahan, Momtaz (2007): "Gender Mainstreaming in Bangladesh Civil Service Prospects and Constraints," *Asian Affairs*, Vol.29, No.1, pp:41-72, January-March 2007.

BBS (2004): *Labour Force Survey (2002-2003),* Bangladesh Bureau of Statistics.

BBS (2008): *Labour Force Survey (2005-2006),* Bangladesh Bureau of Statistics.

Paul-Majumder, Pratima and Begum, Anwara (2006): "Engendering Garment Industry: The Bangladesh Context," University Press Limited (UPL).

Paul-Majumder, Pratima (1986): "Women, Work and Home," Research Report No.49, Human Resource Division (HRD), Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), December 15, 1986.

Rahman, Atiur et.al. (2002): "Early Impact of Grameen: A Multi-Dimensinal Analysis: Outcome of a BIDS Research Study," Grameen Trust.

Shamsuddin, Qazi (1997): "Women's Participation in Employment: Its History and Determinants," Empowerment, Voll. 4, Women for Women, Bangladesh.